দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/SR24007

বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় আইন ও সীমাবদ্ধতা: একটি নৈতিক পর্যালোচনা

(Laws and Limitations for Protecting Environment in Bangladesh: An Ethical Analysis)

এ বি এম শাহীনুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতির সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব প্রাকৃতিক পরিবেশে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রভাবের ভালো-মন্দ উভয় দিক থাকা সত্ত্বেও অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতিতে এক ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ সমস্যা আরো প্রকট। যদিও বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।কিন্তু তারপরও পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণের বাস্তবচিত্র এবং দূষণ সংক্রান্ত আইন উত্থাপন করার মাধ্যমে এটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন থাকা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ও পরিবেশের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে সাধারন মানুষের অসচেতনতা পরিবেশ দূষণ রোধ করতে না পারার অন্যতম কয়েকটি কারণ। এই বিষয়টি ফুটিয়ে তোলায় এই গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্য। গবেষণা কর্মটি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও পিএইচ ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইলঃ shahinur417@gmail.com
বর্তমান প্রবন্ধটি লেখকের পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ জমা দানের পূর্বশর্ত হিসেবে একটি অধ্যায়ের পরিমার্জিত ও বর্ধিত রূপ।

[**Abstract:** As the economy is deeply intertwined with the natural environment, the impact of economic activities on the natural environment is observed. Despite having positive and negative aspect of this impact unplanned industrialization often poses a serious threat to nature. This challenge is especially evident in developing countries like Bangladesh.The government of Bangladesh has placed great importance on environmental protection. The Fifteenth Amendment to our Constitution enshrines the conservation and development of the environment and biodiversity as guiding principles of state management. Government has enacted various laws and regulations aimed at environmental protection. But still, it is not possible to prevent environmental pollution. The discussed article attempts to highlight the real scenario of various types of environmental pollution in Bangladesh and by presenting pollution related laws, it aims to show that despite the existence of a sufficient number of laws, several key factors – such as the lack of coordination among government agencies responsible for enforcement, weak institutional capacity, inadequate knowledge regarding environmental protection laws, and public unawareness about their moral responsibility toward the environment – are among the main reasons for the failure to prevent environmental pollution. The main objective of this research work is to highlight this issue. The research work has been carried out using the historical method].

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎসই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রণীত আইন ও বিধিমালাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত পরিবেশ দূষণ বিষয়ক প্রতিবেদন, বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (যেমন Environmental Performance index – Yale University, IQAir, World Bank প্রভৃতি) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরিবেশ

বাংলা 'পরিবেশ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Environment। ইংরেজি environment শব্দটি ফরাসি environner থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা (surrounding conditions)। কোনো কিছুকে পরিবেষ্টনকারী অন্য সবকিছুই হলো এর

পারিপার্শ্বিক অবস্থা (দাস,২০১৪,পৃ.১৩)। আমাদের চারপাশে রয়েছে মাটি, পানি, আকাশ,বাতাস,পাহাড়, সাগর, নদী, খাল, বৃক্ষরাজি, জীবন্ত নানা প্রাণী, জড় পদার্থ, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, এক কথায় দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার বিভিন্ন উপকরণ। এভাবে পারিপার্শ্বিক সবকিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশ। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ২(ঘ) অনুসারে,"**পরিবেশ** অর্থ পানি, বায়ু, মাটি, ও ভৌত সম্পদ এবং এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ এগুলোর সাথে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক"(doe.gov.bd)।

অর্থাৎ পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশে অস্তিত্বশীল সকল জীবীয় ও অ-জীবীয় উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে। এ অর্থে পরিবেশে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় ধরনের উপাদান বিদ্যমান। প্রাকৃতিক উপাদান বলতে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহকে বোঝায়। যেমন বায়ু, পানি, মাটি, বৃক্ষরাজি, বিভিন্ন প্রাণী ও অনুজীব, বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের উদাহরণ। এ অর্থে, মানুষ নিজেও পরিবেশের একটি প্রাকৃতিক উপাদান। পক্ষান্তরে, পরিবেশের যে সকল উপাদান মানুষ সৃষ্টি করেছে সেগুলোকে মানবসৃষ্ট উপাদান বলে। সভ্যতার বিবর্তন, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাশের জন্য বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে মানবসৃষ্ট পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পরিবেশের মানবসৃষ্ট উপাদান। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ বলতে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশকে বোঝানো হয়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয়

পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পরিবেশ দু'ভাগে বিভক্ত। একটাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্যটা হলো মানবসৃষ্ট পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত বিষয়, এগুলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটায়, ফলে মানবসৃষ্ট পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখা, তার গতিকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বিশেষত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে এবং নানাবিধ পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা আরো প্রকট। এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যত বেশি বিস্তৃত হচ্ছে পরিবেশ ততো বেশি বিপর্যস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণগুলো হলো অপরিকল্পিত শিল্পায়ন,

অনুমোদনহীন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠা, সড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের অবাধ চলাচল, অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যাগের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা প্রভৃতি।

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ

বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।এজন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন ও বিধি প্রবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রবর্তন করা হয়েছে।জাতীয় পরিবেশনীতি, ২০১৮ এর প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় যে, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল দ্বারা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ৮২ বছর মেয়াদী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ গ্রহণ করেছে (doe.gov.bd)। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮এর সংলগ্নী ৩ এ পরিবেশ সংক্রান্ত ১১টি আইন ও বিধিমালার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০), পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬, চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮, বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১, বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭। এগুলো ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আরো ৪টি বিধিমালার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ (doe.gov.bd)।

পরিবেশ দূষণ ও আইন

পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হলেও শিল্পায়নের দিক থেকে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। সে হিসেবে আমাদের দেশে শিল্পজাত বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কম হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেওসাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর তালিকায় প্রথম দিকেই থাকছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক ২০২৪ সালের ২৮ শে মার্চ Building Back a

Greener Bangladesh : Country Environmental Analysis2023, শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণজনিত ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী,

> "চার ধরনের পরিবেশ দূষণজনিত কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ২ লাখ ৭২ হাজারের বেশি মানুষের অকাল মৃত্যু হয়েছে এবং ৫.২ বিলিয়ন দিন অসুস্থতায় অতিবাহিত হয়েছে। এই দূষণজনিতঅর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ওই বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৭.৬ শতাংশের সমান। এরমধ্যে শুধুমাত্র বায়ু দূষণের কারণে ৫৫ শতাংশ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও অনিরাপদ পানি পান, নিম্নমানের পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি এবং রক্তে সীসার পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেদনটি থেকে আরো জানা যায়, সীসা দূষণজনিত কারণে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে বছরে ২০ মিলিয়ন প্রাক্কলিত আইকিউ পয়েন্ট হারাচ্ছে বাংলাদেশ" (World Bank, 2024)।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন ও বিধিমালা থাকার পরেও বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই)- ২০২৪ অনুযায়ী, পরিবেশ রক্ষায় পারদর্শিতা বিষয়ক সূচকে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৫তম স্থানে অবস্থান করছে (epi.yale.edu)। অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের, কারণ বাংলাদেশ একটি কম আয়তনের কিন্তু অধিক জনবহুল দেশ। এরকম একটি জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বপূর্ণ দেশ পরিবেশ রক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে না পারলে দেশবাসীর স্বাস্থ্যসহ সকল ধরনের জীবনমান দিনে দিনে কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখানে সংক্ষেপে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ

বাংলাদেশে বায়ুদূষণের বাস্তব চিত্র খুবই ভয়াবহ। মাত্রাতিরিক্ত দূষিত বায়ুর প্রভাবে রাজধানী ঢাকার জনজীবন বিপর্যস্ত। আইকিউএয়ার-ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, বায়ুতে দূষণকারী বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতির বার্ষিক গড় হিসেবে দূষণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে এবং দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান প্রথম (iqair.com)। ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী ক্ষুদ্র বস্তুকণা 'পিএম ২.৫' ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা 'পিএম ১০'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশনা অনুযায়ী, বাতাসে ক্ষুদ্র বস্তুকণা বা পিএম ২.৫ এর গ্রহণযোগ্য বার্ষিক মানমাত্রা হচ্ছে প্রতি কিউবিক মিটারে ১৫ মাইক্রোগ্রাম এবং পিএম ১০ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার গ্রহণযোগ্য বার্ষিক মানমাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে রাজধানী ঢাকার বাতাসে পিএম ২.৫

এর গড় উপস্থিতি ছিল যথাক্রমে ৮১ মাইক্রোগ্রাম ও ৭৬ মাইক্রোগ্রাম এবং পিএম ১০ এর গড় উপস্থিতি ছিল যথাক্রমে ১৪৮ মাইক্রোগ্রাম ও ১৫৮ মাইক্রোগ্রাম। ২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের কেইস প্রকল্পের আওতায় ঢাকার বায়ুদূষণের উৎস ও ধরন নিয়ে একটি জরিপ হয়। নরওয়ের ইনিস্টিটিউট অব এয়ার রিসার্চের মাধ্যমে করা ওই জরিপে দেখা গেছে ঢাকার চারপাশে প্রায় এক হাজার ইট ভাটা রয়েছে যেগুলো নভেম্বরে ইট উৎপাদন শুরু করে। এ সমস্ত ইট ভাটাগুলো বায়ুদূষণের জন্য ৫৮ শতাংশ দায়ী (মাহমুদ,২০১৮, পৃ. ৫)।ইটভাটার কারণে বায়ুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ২০১৩ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে। এছাড়া ২০১৮ সালে ইট ভাটাগুলোকে পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে নতুন আধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে পর্যায়ক্রমে সকল ইট ভাটাকে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু ২০১৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেশের ৭ হাজার ৭৭২টি ইট ভাটার মধ্যে ২ হাজার ২২৩টি উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করেনি। ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে কোন কোন স্থানে ইট ভাটা স্থাপন করা যাবে না সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কৃষিজমি, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পাহাড় বা টিলার পাদদেশে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নিকটে ইট ভাটা স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু ইট ভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা মান্য করা হয় না। পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসাবে আইন অনুযায়ী ৯৮ শতাংশ ইট ভাটাই অবৈধ। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে স্থানীয় উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কারণ, নিজেদের অনানুষ্ঠানিক খরচ মেটানোর জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোকাল রেভিনিউ ফান্ড(এলআর ফান্ড) নামে একটি বিশেষ ফান্ড গঠন করে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। উক্ত ফান্ডের সিংহভাগ অর্থই ইট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে আসে। বায়ুদূষণের জন্য পরিবহন খাতের দায়ও কম নয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার বায়ুদূষণে পরিবহন খাতের ভূমিকা ১৬ শতাংশ। মেয়াদ উত্তীর্ণ যানবাহন, বিশেষত বাসগুলো সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণ করছে। দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (মাহমুদ,২০১৯, পৃ. ৪)। তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (doe.gov.bd) এর ধারা ৬ এর (১) উপধারায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস বা ধোঁয়া নিঃসরণ করে এমন যানবাহন চালানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আইন অমান্য করেন তাহলে তিনি প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক পাঁচ হাজার এবং দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু পরিবহন খাতে ক্ষমতাসীন

দলের নেতাদের প্রভাব থাকায় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দুটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না (মাহমুদ,২০১৯, পৃ. ৪)।

প্লাস্টিক দূষণ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষক হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে প্লাস্টিক দ্রব্য। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে সিএনএন-এর এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের ক্ষুদ্র প্লাস্টিক (৫ মি.মি. ব্যাসের চেয়ে ক্ষুদ্র) গ্রহণের পরিমাণও বাড়ছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩ কেজি, ২০২০ সালে এ পরিমাণ দাড়িয়েছে মাথাপিছু ৯ কেজি এবং ঢাকায় বসবাসকারীদের জন্য যা ২৪ কেজি। Environmental Science and Technologyসাময়িকীতে ২০২৪ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষ প্রতিমাসে প্রায় সাড়ে সাত গ্রাম ক্ষুদ্র প্লাস্টিক গ্রহণ করে (আলম,২০২৪, পৃ. ৮)। আমাদের দেশের গবেষকরা বিভিন্ন নিরীক্ষায় দেখিয়েছেন আমরা খাবার হিসেবে প্রতিদিন যে মাছ, মাংস ও সবজি খায় সেগুলোতে ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে রুই, তেলাপিয়া, টেংরা, বাটাসহ কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা যায় এমন ১৫টি দেশীয় প্রজাতির মাছে ক্ষতিকর ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। উক্ত গবেষণার জন্য সাভার ও আশুলিয়ার স্থানীয় বাজার থেকে যে মাছ সংগ্রহ করা হয়েছিল তার ৭৩.৩ শতাংশের মধ্যে প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাছে প্লাস্টিক পলিমার হাই ডেনসিটি পলিথিলিন, পলিপ্রপিলিন পলিথিলিন কপোলিমার ও ইথিলিন ভিনাইল এসিটেটের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। এসব প্লাস্টিক পলিমার আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত পানি, জুস, শ্যাম্পুর বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ, কনটেইনার, প্লাস্টিক ও ফোমের জুতা, মোড়ক ইত্যাদি থেকে পরিবেশে প্রবেশ করছে (কবীর,২০২৩, পৃ. ৪)।

প্লাস্টিক বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য ফেলার কারণে ঢাকার কাছাকাছি চারটি নদী ব্যাপকভাবে দূষণের কবলে পড়েছে। ২০২৩ সালের ৫ই জুন, দৈনিক *প্রথমআলো* পত্রিকায় প্রকাশিত “প্লাস্টিক দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করুন” শীর্ষক একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বৈশ্বিক মোট প্লাস্টিক দূষণের ২ দশমিক ৪৭ শতাংশ বাংলাদেশে হয় (epaper.prothomalo.com,পৃ. ৩)।একই তারিখে দৈনিক *প্রথমআলোয়* প্রকাশিত “বুড়িগঙ্গার পাড়ে এক যুগের বেশি পুরোনো প্লাস্টিক” শীর্ষক অপর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সারা বছর দেশে যে পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয় তার ১০ শতাংশই আসে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে। এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্যের মাত্র ৩৭ শতাংশ পুনরায় ব্যবহৃত হয়,

আর বাকি ৬৩ শতাংশই বিভিন্নভাবে মাটি, নদী, নালা, খাল, বিলে গিয়ে মিশে (epaper.prothomalo.com,পৃ.৩)।"প্লাস্টিক পুড়ানোয় বাড়ছে বায়ুদূষণ-তাপমাত্রা" শিরোনামে দৈনিক *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত ভিন্ন একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় প্রতিদিন ৬০০ মেট্রিক টনের বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য হিসেবে জমা হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এসব বর্জ্য হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা নদী-নালায় ফেলে দেওয়া হয়। শুধু ঢাকা নয় সারাদেশেই প্লাস্টিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। সারাদেশে মোট উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় ১০ ভাগ পুড়িয়ে ফেলা হয়, যার পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় চার হাজার টন। ২০১৯ সালে এ কারণে বায়ুমন্ডলে ৮ দশমিক ৫ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত হয়েছে, যা আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ১১ শতাংশ দায়ী বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিক পোড়ানোসহ নানাভাবে বায়ুদূষণের কারণে ২০১৯ সালে দেশে ১ লাখ ৪৬ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু হয়েছে (epaper.prothomalo.com, পৃ. ৩)।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫এর ধারা ৬ক এ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ধারাটি আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারা বলে পরিবেশ আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোনো প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোনো সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তাহলে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ ধরনের সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার নির্দেশ জারি করতে পারবে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পবম-৪/২/৯/২০০২/২৫৬ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করে। কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ পলিথিন সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ করেন তাহলে প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে তিনি সর্বনিম্ন দুই বৎসর, সর্বোচ্চ দশ বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বনিম্ন দুই লক্ষ, সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া যেসকল ব্যক্তিবর্গ নিষিদ্ধ পলিথিন সামগ্রী বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার করবেন তাদের জন্য অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান আইনে উল্লেখ করা হয়েছে (doe.gov.bd)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধের প্রায় দুই যুগ অতিক্রান্ত হলেও নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগে বাজার সয়লাব। ঢাকা ও এর

আশপাশে রয়েছে অসংখ্য পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন কারখানা। এসকল অবৈধ কারখানায় প্রকাশ্যে চলছে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ।

শিল্পায়ন ও পরিবেশ দূষণ

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হলো অপরিকল্পিত শিল্পায়ন। এর সত্যতা আমরা ঢাকা প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ও এর আশ-পাশের পরিবেশের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারব। ঢাকা প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ৩৫৫ একর এবং এখানে প্রায় ৩৮৫ টি শিল্প প্লট রয়েছে। এখানে ৪২ টি স্থানীয় ও বেশ কিছু বিদেশী কর্তৃক স্থাপিত মিল কারখানা রয়েছে। কারখানাগুলোর মধ্যে টেক্সটাইল, ডাইং, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী, ওষুধ, জুতাসহ বিভিন্ন চামড়াজাত দ্রব্য, খেলনা, ছাপা ও কপি করার যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ তৈরি অন্যতম। এসব শিল্পকারখানা থেকে নিকটস্থ ধলাই বিলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ তরল বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। বিভিন্ন ভারী ধাতুর সাহায্যে বিলের পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। এরপর বিল থেকে সেই দূষিত পানি এসে মিলিত হচ্ছে বংশী নদীতে। ফলে ধলাই বিল ও বিল সংলগ্ন বংশী নদীতে মাছের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। তাছাড়া বিল ও চারপাশের কৃষিজমি দূষিত বর্জ্যের প্রভাবে উর্বরতা হারিয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে (আহমদ, ২০১২, পৃ. ৪৩)। অথচ প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো শিল্পকারখানা স্থাপন করতে গেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। এই ছাড়পত্র প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রতিটি শিল্পকারখানাতে বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) থাকতে হবে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট অভিযানে দেখা যায় যে, শতকরা ৯০ ভাগ শিল্পকারখানা বর্জ্য শোধনাগার বন্ধ রেখে দূষিত তরল বর্জ্য সরাসরি নদী, খাল, বিল কিংবা কৃষি জমিতে ফেলছে (ইসলাম, ২০১৯, পৃ. ১৩৯)।

জাতীয় পরিবেশ কমিটি সরকারের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। ১২ বছর পর ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকার নদী দূষণ রোধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে গড়ে ওঠা আড়াইশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন শর্তে বৈধতা দেওয়া হয়। এরপর ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির অপর এক সভায় সুন্দরবনের পাশে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৩২০টি শিল্প কারখানাকে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও উচ্চ আদালতের নির্দেশে পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয় (মাহমুদ, ২০১৯, পৃ. ৪)। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর (৪) উপধারায় বলা হয়েছে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড চালু রাখা বা শুরু করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত আইন অমান্য করেন তাহলে তিনি প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত

হবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দুই বৎসর, সর্বোচ্চ দশ বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বনিম্ন দুই লক্ষ, সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (doe.gov.bd)। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের পাশে অবৈধভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রধান উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান আইনের সুস্পষ্ট লংঘন হয়েছে।

২০২৩ সালের ৫ই জুন দৈনিক *প্রথমআলো* পত্রিকায় "শ্রীপুরে আশংকাজনক হারে নামছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর" শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে আশংকাজনকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। ২০১০ সালে স্বল্প ক্ষমতার বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এখানে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ ফুট গভীর থেকেই পানি উত্তোলন করা যেত। ২০১৩ সাল থেকে পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি দুই বছর পর পর বৈদ্যুতিক সাবমার্সিবল মোটর ৫ থেকে ১০ ফুট নিচে নামিয়ে পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ২০২৩ সালে শ্রীপুরের কোনো কোনো এলাকায় পানির জন্য ৯০ ফুট নিচে মোটর স্থাপন করতে হয়েছে। অর্থাৎ, ১০ বছরে এই অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রায় ৩০ ফুট নিচে নেমে গছে। প্রতিবেদনটিতে এর কারণ হিসেবে অপরিকল্পিত শিল্পায়নকে দায়ী করা হয়েছে। সরকারি হিসাব মতে গাজীপুরে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শিল্পকারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ২ হাজার ৫০০, যার মধ্যে ৫৯০টি ডায়িং কারখানা। এ সকল শিল্পকারখানাগুলো প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে। সবচেয়ে বেশি পানি উত্তোলন করে ডায়িং কারখানাগুলো (epaper.prothomalo.com, পৃ. ৬)। এই অবস্থা চলতে থাকলে শ্রীপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষ আগামী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে তীব্র পানির সংকটের মুখোমুখি হবে। এই সংকট মোকাবিলা করতে হলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যদিও ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য শিল্প-কারখানাগুলোকে পূর্বেই পানির উৎস সম্পর্কে অধিদপ্তরকে জানাতে হয়। শিল্প-কারখানাগুলোকে সাধারণত সারফেস ওয়াটার বা ভূ-উপরিভাগের নদ-নদী বা খালের পানি ব্যবহারের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়। কিন্তু শ্রীপুর শিল্পাঞ্চলে সারফেস ওয়াটারের উৎস কম। সেক্ষেত্রে এখানে এত বেশি সংখ্যক শিল্প-কারখানাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার ঘটনা পরিবেশ অধিদপ্তরেরপ্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে।

শব্দদূষণ

রাজধানী ঢাকা শহরে নীরব ঘাতক শব্দদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ঢাকার শব্দদূষণের এক ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। ২০২৪ সালের

জানুয়ারি মাসে ঢাকা শহরের ৭৭টি রাস্তার সংযোগস্থলে ক্যাপসের ১৫ সদস্যের একটি গবেষক দল শব্দের মাত্রা পরিমাপ করেন। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ৭৭টি রাস্তার সংযোগস্থলে শব্দের গড়মাত্রা ছিল ৯০.২৯ ডেসিবল। এর মধ্যে শব্দের সর্বোচ্চ মান পাওয়া গেছে পল্টন মোড়ে। এখানে দিনের বেলায় শব্দের গড় মাত্রা ছিল ১০৫.৩ ডেসিবল। অন্যদিকে শব্দের মাত্রা সবচেয়ে কম ছিল মিন্টো রোডে ৮০.৫১ ডেসিবল। সিটি কলেজ মোড় ও শিশু হাসপাতাল মোড়ে রাতে শব্দের গড় মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৯৭.৬৯ ডেসিবল ও ৮৫.৩৬ ডেসিবল। রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মোড়ে শব্দের গড় মাত্রা ছিল ৮৩.৪৭ ডেসিবল এবং দিনের বেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় ৮৩.৫৮ ডেসিবল গড়ে শব্দ রেকর্ড হয়েছে (চৌধুরী, ২০২৪, পৃ. ১৬)।

২০০৬ সালের শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার বিধি ৫(২) এর তফসিল-১ এ এলাকাভিত্তিক শব্দে মানমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকাকে নিরব, আবাসিক, মিশ্র, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা এ জাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এবং এদের চারদিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে‘নিরব এলাকা’ বলা হয়েছে। ‘আবাসিক এলাকা’ বলতে এমন এলাকাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে মানুষ পরিবার পরিজনসহ বসবাস করে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট ও হাটবাজার থাকলে সেটাকে ‘বাণিজ্যিক এলাকা’ এবং একাধিক শিল্প ও কল-কারখানা সমৃদ্ধ এলাকাকে ‘শিল্প এলাকা’ বলা হয়েছে। কোনো এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প সবগুলো এলাকার বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে ‘মিশ্র এলাকা’ বলা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী নিরব এলাকায় শব্দের মানমাত্রা দিনে (ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা) ৫০ ডেসিবল ও রাতে (রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা) ৪০ ডেসিবল। আসাসিক এলাকায় দিনে ও রাতে শব্দের মানমাত্রা যথাক্রমে ৫৫ ও ৪৫ ডেসিবল, মিশ্র এলাকায় ৬০ ও ৫০ ডেসিবল, বাণিজ্যিক এলাকায় ৭০ ও ৬০ ডেসিবল এবং শিল্প এলাকায় ৭৫ ও ৭০ ডেসিবল (doe.gov.bd)।

ক্যাপসের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে পল্টন মোড়ে নির্ধারিত মানমাত্রার চেয়ে দেড় গুণ বেশি শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। নিরব এলাকা হিসেবে মিন্টো রোডে দুই গুণ, সিটি কলেজ মোড়ে ২.৪ গুণ, শিশু হাসপাতাল মোড় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মোড়ে ২.১ গুণ এবং টিএসসি এলাকায় ১.৭ গুণ বেশি শব্দ পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই যানবাহনের হর্ণ, ইঞ্জিন থেকে উৎপন্ন শব্দ থেকেই দূষণের ঘটনা ঘটছে। এছাড়া নির্মাণ কাজ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, কল-কারখানা, জেনারেটর ও গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি থেকেও শব্দদূষণ হয়ে থাকে। যদিও বিধিমালার ৭ নং বিধিতে এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম এবং ৮(২) নং বিধিতে নিরব এলাকায় চলাচলের সময় যানবাহনগুলোর হর্ণ বাজানোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি যদি বিধি ৭ ও ৮ এর বিধান লংঘন করেন তাহলে তিনি অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। সেক্ষেত্রে প্রথম অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১ মাস কারাদণ্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (doe.gov.bd)। বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বনভূমি হ্রাস ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি

জাতিসংঘের ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) রিপোর্ট অনুযায়ী, ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা গত এক দশকে প্রায় ১ দশমিক ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও শূন্য দশমিক ৫০ থেকে ১ দশমিক ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের (বিএমডি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা প্রায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য মতে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৭ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে (মজুমদার, ২০২৪, পৃ. ৮)।তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো বনভূমি হ্রাস। দেশের বনভূমি রক্ষা করা হলো বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। বন অধিদপ্তরের নথিতে দেশের বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হলেও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন ভিন্ন কথা বলছে। বন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট ভূমির ১৭ শতাংশ বনভূমি। অন্যদিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তাদের বৈশ্বিক বনভূমি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে বলছে, বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৩ শতাংশ। বনভূমি পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (জিএফও) ও ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনিস্টিটিউট (ডব্লিউআরআই) ২০১৮ সালের ২৭ জুন দেশের বনভূমির বাস্তব চিত্র নিয়ে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় বাংলাদেশে সাত বছরে ৩ লাখ ৩২ হাজার একর বনভূমি উজাড় করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই হচ্ছে দেশের বনভূমি রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর বনের জমি বরাদ্ধ নিয়ে নানা ধরণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিবেদনটি প্রস্তুতকালীন সময় পর্যন্ত ১ লাখ ৬৮ হাজার একর বনভূমি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার নামে বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে (মাহমুদ, ২০১৯, পৃ. ৪)।

আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ একটি ভয়াবহ সমস্যা। পরিবেশ দূষণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হলো শিল্পকারখানার বর্জ্য, নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের সড়কে চলাচল, বনভূমি উজাড় প্রভৃতি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ সমস্যাকে ততোটা গুরুত্ব দিচ্ছে না, যদিও বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন রয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর আত্মপ্রকাশ করলেও দক্ষতা ও লোকবলের অভাব এবং দূষণকারীদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছার অভাবে অধিদপ্তরটি একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। যদিও বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ২০১৪ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, জুলাই ২০১০ থেকে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর শিল্পদূষণ, বায়ুদূষণ, নদী ও জলাশয় ভরাট, পাহাড় কাটার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য ১৭৮৮টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১০৭ কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ আদায় করেছে। এছাড়া ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী ৬৪২টি অভিযান পরিচালনা করে ২৬৭ টন পলিথিন জব্দ, ৬২টি কারখানা বন্ধ ও কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে (ইসলাম, ২০১৯, পৃ. ১৩৯)। কিন্তু বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ও ভয়াবহতা বিবেচনায় এ কার্যক্রম খুবই সামান্য। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখিত গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূ-উপরিভাগের পানির উৎস কম হওয়ার পরও সেখানে অধিক সংখ্যক শিল্প-কারখানাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার মধ্য দিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। অবৈধ ইটভাটা ও প্লাস্টিক কারখানাগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্বল সমন্বয়

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলো পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর , বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব) প্রভৃতি। এরমধ্যে পুলিশ ও র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন, অন্যদিকে পরিবেশ ও বন অধিদপ্তর পরিবেশ, বন ও

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বহু মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক হওয়ার ফলে এ সকল সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশের ক্ষতিসাধনকে অপরাধ বিবেচনা না করার প্রবণতা

বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো পরিবেশ বিষয়ক অপরাধগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা । অর্থাৎ এখানে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করাকে সরাসরি অপরাধ মনে করা হয় না। এগুলোকে অসাবধানতাবশত ভুল হিসেবে বিবেচনা করা হয় (South, 2016, pp. 51-52)। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানাগুলোর বর্জ্য শোধনাগার বন্ধ রেখে দূষিত তরল বর্জ্য সরাসরি নদী, খাল কিংবা কৃষি জমিতে ফেলার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিল্পকারখানাগুলো পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করলেও অধিকাংশ কারখানা বর্জ্য শোধনাগার বন্ধ রাখে। ফলে শিল্প উদ্যোক্তারা প্রতিদিন অনৈতিকভাবে প্রচুর অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হলে অনৈতিকভাবে অর্জিত মুনাফার সামান্য অংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়ে দায়মুক্তি লাভ করে।

তাই বলা যায় শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তাব্যক্তিদের পরিবেশের মূল্য ও ভবিষ্যত প্রজন্মের টেকসই পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার বিষয়ক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

নৈতিক পর্যালোচনা

আলোচ্য অংশে পরিবেশের মূল্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিবেশের মূল্য

পরিবেশের মূল্য বিষয়ে দুই ধরনের পরস্পর বিরোধী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। একটিতে পরিবেশকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান মনে করা হয়। অপরটিতে দাবি করা হয় একমাত্র মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান এবং নৈতিক বিবেচনার যোগ্য। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নৈতিক বিবেচনার অযোগ্য এবং এদের কেবলমাত্র পরতঃমূল্য রয়েছে। পরিবেশের স্বতঃমূল্যে বিশ্বাসীগণ নৈতিক অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী এবং পরতঃমূল্যে বিশ্বাসীগণ নৈতিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদী।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিবেশের মূল্য বিষয়ক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কাকাডু ন্যাশনাল পার্ক খনন বিতর্ক হিসেবে ঘটনাটি বিখ্যাত (Singer, 1991, pp. 284-285)। অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি পার্ক হলো কাকাডু ন্যাশনাল পার্ক। পার্কটিতে কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর (যেমন বিশেষ প্রজাতির তোতা পাখি, শূকর, নাসা কচ্ছপ) অস্তিত্ব রয়েছে। এখানকার উদ্ভিদময় অসমতল বনভূমি, জলাভূমি ও নাব্য খালের রয়েছে নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য ও বাস্তুবিদ্যাগত মূল্য। ঐতিহ্যগতভাবে অস্ট্রেলিয়ার জাওয়িন (Jawoyn) আদিবাসীদের কাছে পার্কটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। সর্বোপরি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও জায়গাটির বিশেষ মূল্য রয়েছে। কাকাডু পার্কটি ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের দিক থেকেও বেশ সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে গোল্ড, প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম জাতীয় খনিজ সম্পদ। এই প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। খনিজ সম্পদ আহরণ করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়া যায়, যা জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাকাডুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুবিদ্যাগত মূল্য, নান্দনিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে পার্কটি সংরক্ষণ করা হবে, নাকি অর্থনৈতিক গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে পার্কটিতে খনন কাজ চালিয়ে খনিজ সম্পদ আহরণ করা হবে?

এই নৈতিক বিতর্কে জীববিদ, ভূ-তাত্ত্বিক এমনকি পরিবেশবাদীরাও দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক পক্ষের বক্তব্য হলো, মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ। পার্কটিতে খনন কাজ চালালে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। সুতরাং, অন্য কোন কিছু বিবেচনায় না নিয়ে এখানে খনন কাজ চালিয়ে যাওয়া নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। অপর পক্ষের বক্তব্য হলো, শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাকাডুতে খনন কাজ চালানোকে নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না, পার্কটির প্রাকৃতিক মূল্যও বিবেচনায় নিতে হবে। এখানে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রয়েছে তার মূল্যের তুলনায় খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য খুবই নগণ্য। পার্কটিতে যে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী রয়েছে তার মূল্য অর্থনৈতিক মূল্যে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই খননের পূর্বে পার্কটির নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্য, বাস্তুবিদ্যাগত মূল্য, ঐতিহ্যগতভাবে গড়ে উঠা আধ্যাত্মিক মূল্য ইত্যাদিও নৈতিক বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

এই বিতর্কে যারা কাকাডু ন্যাশনাল পার্কের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে, সাধারণ অর্থে তাঁরাই নৈতিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। এ মতে বিশ্বাসীরা মনে করেন, কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান ও নৈতিক বিবেচনার যোগ্য, অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নৈতিকতার আওতাভুক্ত নয়। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নিম্নশ্রেণির প্রাণীসমূহকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগাতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টোটল, আধুনিক ফরাসি দার্শনিক রেনে ডেকার্ট, ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড

হিউম এবং জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নাম মানবকেন্দ্রিকতাবাদী হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ইসলাম, ২০১৬ ও ২০১৭, পৃ. ৯)। পক্ষান্তরে, যারা কাকাডুতে খননের পূর্বে পার্কটির প্রাকৃতিক মূল্য বিবেচনার কথা বলেন তাঁরা নৈতিক অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। এ মতে বিশ্বাসীরা কেবল মানুষ নয়, মানুষসহ অ-মানব প্রাণী এবং প্রকৃতিকেও নৈতিকতার অন্তর্ভূক্ত মনে করে (দাস, ২০১৪, পৃ. ৮৭)।

ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার

আমরাজানি, পরিবেশ বিপর্যয়ের দু'ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো তাৎক্ষণিক প্রভাব এবং অপরটি হলো বিলম্বিত প্রভাব। পরিবেশ বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, বিলম্বিত প্রভাব বর্তমান প্রজন্মকে অতিক্রম করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে। তাই বর্তমান সময়ে আমরা পরিবেশকে কীভাবে ব্যবহার করছি এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত এ ধরনের নৈতিক প্রশ্নের সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। "ভবিষ্যত প্রজন্ম বলতে সাধারণত ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হবে বা থাকবে এমন প্রজন্ম বা মানুষকেই বুঝায়" (ইসলাম, ২০১৬ ও ২০১৭, পৃ. ১২)। এ সম্পর্কে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক এ্যালেন টাফ বলেন, "আমরা যদি বর্তমান সময় থেকে কয়েক দশক পরের মানব সভ্যতার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে বিভিন্ন বয়সী মানুষ খেলছে, কাজ করছে, কিছু তৈরি করছে, আনন্দ করছে, কাঁদছে, ভালবাসছে। এ সকল মানুষকেই আমরা ভবিষ্যত প্রজন্ম বলি" (Tough, 1993, p.1041)। অর্থাৎ এ্যালেন টাফ এখানে ভবিষ্যত প্রজন্ম বলতে ভবিষ্যত পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল থাকবে এমন মানুষদের বুঝিয়েছেন।

ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারের প্রশ্নটি বিংশ শতাব্দীর সত্তুরের দশক থেকে দার্শনিকদের আলোচনায় স্থান পেয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান দার্শনিক জোয়েল ফিনবার্গ ভবিষ্যতের অ-জাত (unborn) প্রজন্মের অধিকার ও স্বার্থ বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত "The Rights of Animals and Unborn Generations" নামক প্রবন্ধে। তিনি দাবি করেন আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যে পৃথিবী আমরা পেয়েছি তাকে ধ্বংস করার সকল শক্তিই আমাদের আছে। আমরা আরো অধিক সংখ্যায় বংশ বৃদ্ধি করতে পারি, উর্বর জমিকে অধিক হারে ব্যবহার করে অনুর্বর করতে পারি, সাগর, নদী ও জলাশয় গুলোকে বর্জ্য ফেলে ধ্বংস করতে পারি, বিষাক্ত গ্যাসে বাতাস পরিপূর্ণ করতে পারি (Feinberg, 1974, p. 64)। তবে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই এ বিষয়ে একমত হবেন যে এ ধরনের কাজ করা আমাদের উচিত হবে না। ফিনবার্গ মনে করেন অধিকাংশ চিন্তাবিদই এ কথা বলবেন যে এ ধরনের কাজ পরিহার করা আমাদের

জন্য কর্তব্য। কারণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা আমাদের রয়েছে।

অস্ট্রেলীয় নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার 'প্রাকৃতিক জীবনচক্র' (Natural life cycle) মতবাদ অবতারণার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, "প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করে বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস করার মাধ্যমে আমরা সাময়িক সময়ের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারব। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বনটির সাথে জড়িত সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং প্রাকৃতিক জীবনচক্র বাধাগ্রস্ত হবে" (Singer, 2011, p.242)। পূর্বে উল্লিখিত কাকাডু ন্যাশনাল পার্কটির কথা বলা যেতে পারে। এখানকার খনিজ সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে যদি পার্কটিতে খনন কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে গোল্ড, প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম, ইউরেনিয়াম জাতীয় পদার্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু পার্কটি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। এখানকার বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ও বহু বছরের পুরাতন উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে। নতুন করে বৃক্ষ রোপন করে এবং কৃত্রিম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে পুনরায় একটি পার্ক হয়ত তৈরি করা সম্ভব হবে, তবে পূর্বের পার্কটি আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ফলে অতীতের সাথে বর্তমানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। এটি এমন বিষয় যা পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং অবশ্যই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষণ করব, যদি এটি পাওয়ার জন্য তারা বেঁচে থাকে।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই উপলব্ধি করতে পারি যে স্বাভাবিক মানুষ মাত্রই তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বশীল থাকেন। পূর্ব পুরুষদের থেকে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী না পেলে এখানে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

উপসংহার

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশ সুরক্ষার সমন্বয় সাধন করা।যদিও আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট আইন রয়েছে। আইনগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর রয়েছে। কিন্তু তারপরও পরিবেশ সুরক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দূষণকারী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বাধা হিসেবে কাজ করছে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার মত ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই। এর বাইরে গিয়েও অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ দূষণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেক্ষেত্রে দূষণকারীরা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করার মাধ্যমে অনৈতিকভাবে অর্জিত বিপুল মুনাফার সামান্য অংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ জরিমানা দিয়ে দায় মুক্তি লাভ করে। এর কারণ হতে পারে দূষণকারীরা পরিবেশের মূল্যের ব্যাপারে সচেতন না, অথবা তারা

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য জেনে বুঝে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু দূষণকারীদের এই মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পরিবেশের অর্থনৈতিক মূল্যের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক, নান্দনিক ও বাস্তুবিদ্যাগত মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। পরিবেশের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে আইন মান্য করার সদিচ্ছা জাগ্রত করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আলম, এ কে এম খোরশেদ। (০৫ জুন ২০২৪)। "পরিবেশ দূষণ: মানব জাতির অস্তিত্বের সংকট"। *দৈনিক ইত্তেফাক*। ঢাকা।

আহমদ, জসীম উদ্দিন। (২০১২)। *বিজ্ঞান ও পরিবেশ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

ইসলাম, হাফিজুল। (২০১৯)। "প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি ব্যবসায়ীদের আচরণ ও নৈতিক দায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"। *অন্বেষণ*। অষ্টাদশ সংখ্যা। দর্শন বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, হাফিজুল। (২০১৬ ও ২০১৭। "ব্যবসায়িক আচরণ ও পরিবেশ নৈতিকতা: একটি বিশ্লেষণ"। *জীবন দর্শন*। Vol. 6&7। দর্শন বিভাগ: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

কবীর, ইকরাম। (০৪ জুন, ২০২৩)। "প্লাস্টিকে বন্দি জীবন"। *দৈনিক সমকাল*: ঢাকা।

চৌধুরী, খায়রুল কবির। (১৩ মে, ২০২৪)। "ঢাকার রাস্তায় আড়াই গুণ বেশি শব্দ"। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*: ঢাকা।

জাতীয় পরিবেশ নীতি। (২০১৮)। লিংক: doe.gov.bd। প্রবেশের তারিখ: ১৯/০৫/২০২৪। সময়: ১:৩০ PM।

দাস, কালী প্রসন্ন। (২০১৪)। *পরিবেশ দর্শন: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

"প্লাস্টিক দূষণ রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করুন"। (০৫ জুন ২০২৩)। epaper.prothomalo.com। প্রবেশের তারিখ: ২১/১০/২০২৪। সময়: ৭:১৩ PM।

"প্লাস্টিক পুড়ানোয় বাড়ছে বায়ুদূষণ-তাপমাত্রা"। (০৫ জুন ২০২৩)। epaper.prothomalo.com। প্রবেশের তারিখ: ২১/১০/২০২৪। সময়: ৭:১৫ PM।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। (১৯৯৫)। প্রজ্ঞাপন নং পবম-৪(৮ আই: বি:)/২/৯৫(অংশ-১)/২৯৪। লিংক: doe.gov.bd। প্রবেশের তারিখ: ১৯/০৫/২০২৪। সময়: ১:৩১ PM।

"বুড়িগঙ্গার পাড়ে এক যুগের বেশি পুরোনো প্লাস্টিক"। (০৫ জুন ২০২৩)। epaper.prothomalo.com। প্রবেশের তারিখ: ২১/১০/২০২৪। সময়: ৭:০৮ PM।

মজুমদার, আহমদ কামরুজ্জামান। (০৫ জুন, ২০২৪)। "প্রকৃতির সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই"। *দৈনিক প্রথম আলো* : ঢাকা।

মাহমুদ, ইফতেখার। (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)। "বায়ুদূষণে ৫৪ ধাপ অবনতি"। *দৈনিক প্রথম আলো*: ঢাকা।

মাহমুদ, ইফতেখার। (১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯)। "পরিবেশ দূষণে টানা অবনতি"। *দৈনিক প্রথম আলো*: ঢাকা।

শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা। (২০০৬)। এস, আর, ও নং ২১২-আইন/২০০৬। লিংক: doe.gov.bd। প্রবেশের তারিখ: ১৯/০৫/২০২৪। সময়: ১:৪৬ PM।

"শ্রীপুরে আশংকাজনক হারে নামছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর"। (০৫ জুন ২০২৩)। epaper.prothomalo.com। প্রবেশের তারিখ: ২১/১০/২০২৪। সময়: ৭:১৯ PM। http://documents.worldbank.org/curated/en/099032524104513038/P1759081e5bea606919264108860d107158. প্রবেশের তারিখ: ১৭/০৯/২০২৪। সময়: ১১:০০ AM। epi.yale.edu. প্রবেশের তারিখ: ১৪/০৯/২০২৪। সময়: ১২:১০ PM।

Feinberg, Joel. (1974). "The Rights of Animals and Unborn Generations". in Blackstone, William T. (ed.).*Philosophy & Environmental Crisis*, GA: The University of Georgia Press. Athens. pp. 43-68.iqair.com. প্রবেশের তারিখ: ১৪/০৯/২০২৪। সময়: ১২:২৫ PM।

Singer, Peter. (1991). *A Companion to Ethics*. Blackwell: UK.

Singer, Peter. (2011). *Practical Ethics* (3rd edition). Cambrige University Press: New York.

South, N. (2016). "Free trade agreements, private courts, and environmental exploitation: Disconnected policies, denials and moral disengagement". *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*. 5(4).

Tough, Allen. (1993). "What Future Generations Need from Us". *Future*. Butterworth-Heinmann Ltd. Oxford.